নবম অধ্যায়

নতুন দিনের নাস্তিকতা: আগামীর ভাইরাসমুক্ত সমাজ

ঈশ্বর খুবই ভঙ্গুর; বিজ্ঞানের ছোট্ট একটি ফুলকি অথবা একটু সাধারণ জ্ঞানই তাকে মেরে ফেলতে সক্ষম।
চ্যাপম্যান কোয়েন

বিশ্বাসের দীনতা

১৬৩৩ সাল। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে- বাইবেল বিরোধী এই সত্য কথা বলার অপরাধে চার্চ খ্যাতনামা বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে অভিযুক্ত করলো 'ধর্মদ্রোহিতার' অভিযোগে। গ্যালিলিও তখন প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ। অসুস্থ ও বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে জোর করে ফ্লোরেন্স থেকে রোমে নিয়ে যাওয়া হলো, হাটু ভেঙ্গে সবার সামনে জোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে বলতে বাধ্য করা হয় এতদিন গ্যালিলিও যা প্রচার করেছিলেন তা ধর্মবিরোধী, ভুল ও মিথ্যা। বাইবেলে যা বলা হয়েছে সেটিই আসল, সঠিক- পৃথিবী স্থির অনড়- সৌর জগতের কেন্দ্রে[1]। গ্যালিলিও প্রাণ বাঁচাতে তাই করলেন। পোপ ও ধর্মসংস্থার সম্মুখে গ্যালিলিও যে স্বীকারোক্তি ও প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করেন, তা বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে ধর্মীয় মৌলবাদীদের নির্মমতার এবং জ্ঞান সাধকদের কাছে বেদনার এক ঐতিহাসিক দলিল[2]-

> আমি ফ্লোরেন্সবাসী স্বর্গীয় ভিন্সেঞ্জিও গ্যালিলিওর পুত্র, সত্তর বৎসর বয়স্ক গ্যালিলিও গ্যালিলি সশরীরে বিচারার্থ আনীত হয়ে এবং অতি প্রখ্যাত ও সম্মানার্হ ধর্মযাজকদের (কার্ডিনাল) ও নিখিল খ্রিস্টীয় সাধারণতন্ত্রে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণজনিত অপরাধের সাধারণ বিচারপতিগণের সম্মুখে নতজানু হয়ে স্বহস্তে ধর্মগ্রন্থ স্পর্শপূর্বক শপথ করছি যে, রোমের পবিত্র ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম সংস্থার দ্বারা যা কিছু শিক্ষাদান ও প্রচার করা হয়েছে ও যা কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে আমি তা সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি, এখনও করি এবং ঈশ্বরের সহয়তা পেলে ভবিষ্যতেও করব। সূর্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ও নিশ্চল এরূপ মিথ্যা অভিমত যে কীরূপ শাস্ত্রবিরোধী সেসব বিষয় আমাকে অবহিত করা হয়েছিল; এ মিথ্যা মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে এর সমর্থন ও শিক্ষাদান থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত থাকতে আমি এই পবিত্র ধর্মসংস্থা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে একই নিন্দিত ও পরিত্যক্ত মতবাদ আলোচনা করে ও কোনো সমাধানের চেষ্টার পরিবর্তে সেই মতবাদের সমর্থনে জোরালো যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছি। এজন্য গভীর সন্দেহ এই যে আমি খ্রিস্টধর্মবিরুদ্ধ মত পোষণ করে থাকি। .... অতএব সঙ্গত কারণে আমার প্রতি আরোপিত এই অতিঘোর সন্দেহ ধর্মাবতারদের ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকের মন হতে দূর করবার উদ্দেশ্যে সরল অন্তকরণে ও অকপট বিশ্বাসে শপথ করে বলছি যে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ও ধর্মবিরুদ্ধ মত আমি

---

1 পবিত্র বাইবেলে আছে,
'আর জগৎও অটল- তা বিচলিত হবে না' (ক্রনিকলস ১৬/৩০)
'জগৎ ও সুস্থির, তা নড়াচড়া করবে না।' (সাম ৯৩/১)
'তিনি পৃথিবীকে অনড় এবং অচল করেছেন' (সাম ৯৬/১০)
'তিনি পৃথিবীকে এর ভিত্তিমূলের উপর স্থাপন করেছেন, তা কখনো বিচলিত হবে না' (সাম ১০৪/৫) ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে আরো দেখুন বইয়ের ষষ্ঠ (বিজ্ঞানময় কিতাব) অধ্যায়টি।

2 অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৬

> ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করি। ...আমি শপথ করে বলছি যে, আমার উপর এজাতীয় সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে, এরূপ কোনো বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর কখনো কিছু বলব না বা লিখব না। এরূপ অবিশ্বাসীর কথা জানতে পারলে অথবা কারও উপর ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ পোষণের সন্দেহ উপস্থিত হলে পবিত্র ধর্মসংস্থার নিকট অথবা যেখানে অবস্থান করব সেখানকার বিচারকের নিকট আমি তা জ্ঞাপন করব। শপথ নিয়ে আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই পবিত্র ধর্মসংস্থা আমার উপর যেসব প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ প্রদান করবে আমি তা হুবহু পালন করব। এসব প্রতিজ্ঞা ও শপথের যেকোনো একটি যদি ভঙ্গ করি তাহলে শপথভঙ্গকারীর জন্য ধর্মাধিকরণের পবিত্র অনুশাসনে এবং সাধারণ অথবা বিশেষ আইনে যেসব নির্যাতন ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব। অতএব ঈশ্বর ও যেসব পবিত্র গ্রন্থ আমি স্পর্শ করে আছি এরা আমার সহায় হোন। আমি উপরে কথিত গ্যালিলিও গ্যালিলি শপথ গ্রহণ ও প্রতিজ্ঞা করলাম এবং নিজেকে উপর্যুক্তভাবে বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে প্রতিশ্রুত হলাম। এর সাক্ষ্য হিসেবে স্বহস্তলিখিত শপথনামা যার প্রতিটি অক্ষর এইমাত্র আপনাদের পাঠ করে শুনিয়েছি তা আপনাদের নিকট সমর্পন করছি। (২২শে জুন, ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ, রোমের মিনার্ভা কনভেন্ট)।

শোনা যায়, এর মধ্যেও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ গণিতজ্ঞ-জ্যোতির্বিদ স্বগতোক্তি করেছিলেন- 'তার পরেও কিন্তু পৃথিবী ঠিকই ঘুরছে'। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ নিয়েই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ১৬৪২ সালে, নিজ গৃহে, অন্তরীণ অবস্থায়। শুধু গ্যালিলিওকে অন্তরীণ করে নির্যাতন তো নয়, ব্রুনোকে তো পুড়িয়েই মারলো ঈশ্বরের সুপুত্ররা। তারপরো কি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা ঠেকানো গেল?

শুধু গ্যালিলিও বা ব্রুনো নয়, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, হাইপেশিয়া, এনাক্সোগোরাস, ফিলিপ্রাস প্যারাসেলসাস, এনাকু সিমন্ড, লুসিলিও ভানিনি, টমাস কিড, ফ্রান্সিস কেট, বার্থৌলোমিউ, লিগেট, ইবনে খালিদ, যিরহাম, আল দিমিস্কি, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, ইবনে বাজা, আল কিন্দী, আল রাজি কিংবা ইবনে রুশদসহ অনেককেই ধর্মান্ধদের হাতে নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হয়ে নিহত হতে হয়। মুক্তমনা লেখকেরা এধরনের নিপীড়নের অনেক পরিসংখ্যান হাজির করেছেন তাদের বইপত্রে[3]।

বিশ্বাসের উদ্ভব

বিশ্বাসের উদ্ভব সমাজে কীভাবে হলো তা বিভিন্ন আলোচক বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করবেন, অতীতেও করেছেন। তবে আমরা- এ বইয়ের দুজন লেখক মনে করি, বিশ্বাসের পুরো ব্যাপারটিকে আসলে নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক এবং জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখলে বিষয়ের সম্পূর্ণতা আসে না। এ বইয়ে আমরা তাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্বাসের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করেছি, যা আধুনিককালে ধর্মসংক্রান্ত গবেষণার সবচাইতে অগ্রসর এবং সজীব ক্ষেত্র বলে মনে করা হয়। আমরা বইটি লিখতে গিয়ে বিশ্বাসের অবদানকে গায়ের জোরে অস্বীকার করি নি। আমরা আমাদের বইয়ে স্বীকার করেছি যে, 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা মানব জাতির বেঁচে থাকার পেছনে হয়তো কোনো বাড়তি উপাদান যোগ করেছিল একটা সময়। মানুষ আদিমকাল থেকে বহু সংঘাত, মারামারি এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আজ এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। একটা সময় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করাটা ছিল মানব জাতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে অনেক বড় নিয়ামক। যে গোত্রে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পারা গিয়েছিল যে যোদ্ধারা সাহসের সাথে যুদ্ধ করে মারা গেলে পরলোকে গিয়ে পাবে অফুরন্ত সুখ, সাচ্ছন্দ্য, হুর পরী উদ্ভিন্নযৌবনা চিরকুমারী অপ্সরা, (আর বেঁচে থাকলে তো আছেই সাহসী যোদ্ধার বিশাল সম্মান আর পুরষ্কার)- তারা

3 এ প্রসঙ্গে দেখুন, নুরুজ্জামান মানিক, ইসলামের চিন্তার ইতিহাসে যারা সত্যের শহীদ, 'বিজ্ঞান ও ধর্ম- সংঘাত নাকি সমন্বয়?', মুক্তমনা ই-বুক।

হয়তো অনেক সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছে এবং নিজেদের এই যুদ্ধাংদেহী জিন পরবর্তী প্রজন্মে বিস্তৃত করতে সহায়তা করেছে।

এই বইয়ে আমরা মানব সভ্যতাকে শিশুদের মানসজগতের সাথে তুলনা করেছি। আমরা দেখিয়েছি, শিশুদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই একটা সময় পর্যন্ত অভিভাবকদের সমস্ত কথা নির্দ্বিধায় মেনে চলতে হয়। শিশুরা একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত তার অভিভাবকের কথা নির্দ্বিধায় বিশাস করে এবং পালন করে বলেই তারা বিপদ থেকে রক্ষা পায়, টিকে থাকতে পারে। কিন্তু শিশুটির অভিভাবকেরাই যখন অসংখ্য ভালো উপদেশের পাশাপাশি আবার কিছু মন্দ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপদেশও দেয়, তখন শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না সেই মন্দ বিশ্বাসকে অন্য দশটা বিশ্বাস কিংবা ভালো উপদেশ থেকে আলাদা করার। সেই মন্দবিশ্বাসও বংশপরম্পরায় সে বহন করতে থাকে অবলীলায়। সব বিশ্বাস খারাপ তা আমরা বলি নি, কিন্তু আমরা বলতে চেয়েছি, অসংখ্য মন্দ বিশ্বাস হয়তো ভাইরাসের মতো একটা সময় প্রগতিকে থামাতে চায়, সভ্যতাকে ধ্বংস করে। ডাইনি পোড়ানো, সতীদাহ, বিধর্মী এবং কাফেরদের প্রতি ঘৃণা, মুরতাদদের হত্যা- এগুলোর উদাহরণ তো হাতের সামনেই আছে। এগুলো যে বিশ্বাসের প্রসারে বেড়ে ওঠা ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ছাড়া কিছু নয়, তাতে অনেকেই একমত হবেন। কীভাবে বিশ্বাস নির্ভর ব্যবস্থা টিকে আছে, কীভাবে আমরা বিশ্বাসগুলো বংশ পরম্পরায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দেই তা বুঝতে হলে সামাজিক জীববিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণাগুলোকে বুঝতে হবে। রিচার্ড ডকিন্স তার 'সেলফিশ জিন' বইয়ে আর সুজান ব্ল্যাকমোর তার 'মিম মেশিন' বইয়ে কীভাবে বিশ্বাস বংশপরম্পরায় টিকে থাকে অনেক আকর্ষণীয় উদাহরণ হাজির করেছেন। আমরাও এই বইয়ের সপ্তম এবং অষ্টম অধ্যায়ে বিশ্বাসের আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হাজির করেছি।

মানব সভ্যতার সূচনা পর্বে ধর্ম ছিল জাদু বিদ্যাকেন্দ্রিক, অনেক নবী পয়গম্বর ছিলেন আসলে জাদুকর। বহুকাল আগে, জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষের এক গোত্রের কথা চিন্তা করা যাক। গোত্রের সব মানুষের সামনে একজন সামান, জলন্ত আগুনে ছুঁড়ে দিলেন মুঠোভর্তি কালো গুড়ো। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিস্ফোরণে আগুনের শিখা উপরে উঠে গেল। দর্শকদের কাছে ঘটনাটি গণ্য হলো জাদু হিসেবে। এবং এই 'অতিপ্রাকৃত ঘটনা' সবার সামনে ঘটানোর জন্য সামান নিজেকে দাবি করলেন সবার চেয়ে আলাদা একজন, বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে। উদাহরণ হিসেবে সামনে আনা যেতে পারে সামানদের দৃষ্টান্তকে। সামান গোত্রভুক্তরা তাদের মনে থাকা অসংখ্য প্রশ্ন ও বিভিন্ন ঘটনা কে ঘটাচ্ছেন এমন প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে দ্বারস্থ হতেন জাদুকর সামানদের কাছে। ইচ্ছা, পেছনে থাকা একজনকে খুঁজে বের করা- যার ইশারায় ঝড় হয়, যার ইশারায় তারা খাবারের সন্ধান পায়, যার ক্রোধে মহামারীতে তাদের অর্ধেকেরও বেশি দুম করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সভ্যতার এই পর্যায়ে এসে আমরা দেখতে পাই, সামানরা নিজেরাও আলাদা কেউ ছিলেন না, তাদের জাদুটাও সত্যিকার অর্থে জাদু নয়, রাসায়নিক বিক্রিয়া। সামানরা নিজেদের ক্ষমতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বানিয়ে বানিয়ে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, গোত্রের সবাই মাথা নত করে তার কথা মেনে নিতো। কখনো সূর্য, কখনো দূরে থাকা কোনো পাহাড়কে পূজা করতো।

প্রথমদিকে, মানুষ ছোট ছোট গোত্রে বাস করতো। তখন থেকেই সমঝোতা, ইট-মারলে পাটকেল (tit-for-tat), সততা, সহমর্মিতা, বিনিময়ী পরার্থতা (Reciprocal Altruism) প্রভৃতি মূল্যবোধ প্রায় সবার মধ্যেই ছিল। গরিলা, শিম্পাঞ্জি, নেকড়ে এমন কি মৌমাছি, পিঁপড়ার মতো কিছু সামাজিক প্রাণীর মধ্যেও এই ধরনের কিছু মূল্যবোধের কম- বেশি উপস্থিতির ফলে আমরা নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারি, কোনো ঐশী প্রক্রিয়ায় মূল্যবোধগুলো মানব সমাজে উদ্ভূত হয় নি, বরং জৈবিক সামাজিক বিবর্তনের ফলাফল স্বরূপ এগুলো বিবর্তনের ধারাবাহিকতাতেই উদ্ভূত হয়েছে মানুষের মধ্যে (আমরা এই বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে এ ব্যাপারগুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি)। পরবর্তীতে সমাজ আরো জটিল হয়েছে। সেই জটিলতা স্পর্শ করেছে নৈতিকতা আর মূল্যবোধগুলোকেও। যেমন, কৃষিকাজের ব্যাপক অগ্রগতির ফলে

গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল একসময়, অপরিচিতের সাথে আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হওয়ায় দেখা গেল, আগেকার সেই ছোট গোত্রের মূল্যবোধে ঠিকঠাক কাজ হচ্ছে না। এই কারণে সমাজপতি এবং নেতারা সবাইকে সংঘবদ্ধ রাখার জন্য আরও কিছু নিয়ম-কানুন সমাজে সংযুক্ত করা শুরু করলেন। তারা ভাবলেন, কেউ কিছু বললেই তো আর মানুষ শুনবে না, এই সংশয়ে কেউ কেউ সেই নিয়ম-কানুনগুলোকে 'ঈশ্বর প্রদত্ত আইন' বলে প্রচার করলেন। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘবদ্ধ ধর্মের সূচনা তাই কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরঞ্চ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই অঞ্চলগুলোয় কৃষিকাজের দ্রুত উন্নতি তৈরি করেছিল যাজক শ্রেণী। সেখানকার রাজারা নিজেদের প্রকাশ করতেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে। খ্রিস্টান রাজারা চার্চের সহায়তার কারণে যেকোনো কাজ করাকে স্বর্গীয় অধিকার বলে মনে করতেন। এধরনের ঘটনা আমরা অন্য অনেক জায়গায়ই দেখি। যেমন, চীনেও একসময় রাজাকে মানব সমাজের স্বর্গীয় প্রতিনিধি হিসেবে ভাবা হতো বহুদিন।

কীভাবে নতুন ধর্ম তৈরি হয়, কীভাবে ধর্মের অনুসারী তৈরি হয়, কীভাবে মানুষ নবী রাসুলকে বিশ্বাস করতে শেখে তা একটা চমৎকার উদাহরণের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা কিন্তু দেখিয়েছেন কার্গো কাল্ট (Cargo Cult) নিয়ে গবেষণা করে[4]। 'কার্গো কাল্ট' হলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে বর্তমান ধর্মবিশ্বাসগুলোর একটি সম্মিলিত নাম- যারা কার্গো- জাহাজগুলোকে স্বর্গীয় দূতের পাঠানো সামগ্রী মনে করতো। জাহাজের ইউরোপিয়ান নাবিকেরা কীভাবে রেডিও শোনে, কেন কোনো সারাইয়ের কাজ করতে হয় না, রাতে কী করে আলো জ্বালায়- এ সবই দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা অদ্ভূত বিস্ময়ে দেখত। তাদের কাল্টপ্রধান জন ফ্রাম চিরতরে চলে যাবার আগে সেসময় অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন- দ্বিতীয়বারে জাহাজভর্তি সামগ্রী আনবে ও সাদা আমেরিকানদের চিরকালের মতো দ্বীপ থেকে বিতাড়িত করা হবে ইত্যাদি বলে। দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে আদিবাসীরা অপেক্ষা করে আছে জন কখন আসবে তাদের মুক্তি দিতে। আপনি কি তার সাথে মিল পান বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের মুক্তি পাবার জন্য পুনরুত্থিত যিশুখ্রিস্ট কিংবা ঈমাম মাহাদির জন্য অপেক্ষাকে।

ধর্মের কুফল

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। মেহেদি রাঙ্গানো দাড়ির এই লোককে আমরা সবাই চিনি, বেসরকারি টিভি চ্যানেল এনটিভির অনুষ্ঠান 'আপনার জিজ্ঞাসা'র বদৌলতে। এ মানুষটি সপ্তাহান্তে আমাদের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন, কীভাবে চলতে হবে তার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি কীভাবে চলেছিলেন? এখনকার মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, তখন পরিচিত ছিলেন খাড়াদিয়ার বাচ্চু নামে, তার নামে ভয়ে কাঁপতো ফরিদপুর এলাকা। ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার যদুনন্দী ইউনিয়নের বড় খাড়দিয়া গ্রামের প্রায় শতাধিক যুবককে নিয়ে তৈরি এই মিলিটারি বাহিনী স্থানীয়দের কাছে পরিচিত ছিল, 'খাড়দিয়ার মেলিটারি' নামে। পাক-বাহিনীর দোসর এই বাহিনী, খাড়দিয়ার আশেপাশের প্রায় ৫০ গ্রাম জনপদে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে চালিয়েছিল তাণ্ডবলীলা। স্থানীয়দের বরাতে জানা যায়, এই বাচ্চু ও তার বাহিনী একাত্তরে নৃশংসভাবে হত্যা করে হাসামদিয়ার হরিপদ সাহা, সুরেশ পোদ্দার, মল্লিক চক্রবর্তী, সুবল কয়াল, শরৎ সাহা, শ্রীনগরের প্রবীর সাহা, যতীন্দ্রনাথ সাহা, জিন্নাত আলী ব্যাপারী, ময়েনদিয়ার শান্তিরাম বিশ্বাস, কলারনের সুধাংশু রায়, মাঝারদিয়ার মাহাদেবের মা, পুরুরার জ্ঞানেন, মাধব, কালিনগরের জীবন ডাক্তার, ফুলবাড়িয়ার চিত্তরঞ্জন দাস, ওয়াহেদ মোল্লা, দয়াল, মোতালেবের মা, যবদুল, বাদল নাথ, আস্তানার দরবেশসহ বিভিন্ন জনপদের প্রায় শতাধিক মানুষকে। ফতোয়া সম্পর্কিত হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়ের রিরুদ্ধে লিভ

4 রিচার্ড ডকিন্স তার 'গড ডিলুশন' বইয়ে কার্গো কাল্টদের নিয়ে আলাদা ভাবে লিখেছেন Richard Dawkins, God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt; 1st Am. ed. Edition, 2006 PP. 202-207.

আবেদন কারী ও বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ বাচ্চুর বর্তমান অবস্থা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, নগরকান্দা উপজেলার দাদপুর ইউনিয়নের নতিবদিয়া গ্রামের শোভা রানী বিশ্বাস। একাত্তরে তিনি এই আবুল কালাম আজাদের কাছে হয়েছিলেন ধর্ষিত। এ গ্রামেরই নগেন বিশ্বাসের স্ত্রী দেবী বিশ্বাসেরও সম্ভ্রম লুটেছিলেন বাচ্চু। নতিবদিয়ার প্রবীণ দুই মৎস্যজীবি নকুল সরদার ও রঘুনাথ দত্ত ২০০০ সালে প্রকাশিত জনকন্ঠের 'তুই রাজাকার' শীর্ষক ধারাবাহিক রিপোর্টের রিপোর্টার প্রবীর সিকদারকে জানান লুটপাট- হামলা না করার শর্তে আমরা চাঁদা তুলে বাচ্চুকে দু'হাজার চার শ' টাকা দিয়েছিলাম। তারপরও সে লুটপাট করেছে, গ্রামের দুই নববধূর ইজ্জত হরণ করেছে। পুরুরা গ্রামের জ্ঞানেন জীবন বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে কচুরিপানার নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। বাচ্চু সেখানেই তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বাচ্চুর রাইফেলের গুলিতে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান ফরিদপুরের ফুলবাড়িয়ার চিত্তরঞ্জন দাস। সেদিন তার অন্তঃসত্তা স্ত্রী জ্যোৎস্না পালিয়ে রক্ষা পেলেও একাত্তরে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় তার তিন শিশু সন্তান। স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘদিন জ্যোৎস্না শুধু তার স্বামী হন্তারকের বিচার চেয়েছিলেন মনে মনে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে সাংবাদিক প্রবীর সিকদার দৈনিক জনকণ্ঠে বাচ্চুসহ ফরিদপুর অঞ্চলের রাজাকারদের নিয়ে 'তুই রাজাকার' শীর্ষক প্রামাণ্য সিরিজ প্রতিবেদন করায় তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে অস্ত্র, গুলি ও বোমা হামলা চালানো হয়। এ হামলার পেছনে তখন কুখ্যাতরাজাকার নূলা মুসা ও বাচ্চুর ইন্ধনের অভিযোগ ওঠে[5]।

ধর্ম না থাকলেও হয়তো, মুক্তিযুদ্ধে আবুল কালামের মতো লোকেরা নিরাপরাধদের ধরে ধরে হত্যা করতো। কিন্তু ধর্ম থাকাতে একাত্তরে অসংখ্য বির্ধর্মীদের প্রাণ দিতে হয়েছে মাওলানা আজাদের পুণ্য কাজের খেসারত স্বরূপ। আজাদরা মনে মনে শান্তি পেয়েছেন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষার জন্য তারা আল্লাহর হয়ে কাজ করছেন ভেবে। সেটাও হলো, কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপারটা আসে আরও পরে। হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, এদেশের মুসলমান এক সময় ছিলেন মুসলমান বাঙালি, তারপর বাঙালি মুসলমান, তারপর বাঙালি হয়েছিল; এখন আবার তারা বাঙালি থেকে বাঙালি মুসলমান, বাঙালি মুসলমান থেকে মুসলমান বাঙালি, এবং মুসলমান বাঙালি থেকে মুসলমান হচ্ছেন। পৌত্রের ঔরষে জন্ম নিচ্ছে পিতামহ। হুমায়ুন আজাদ সত্যিই বলেছিলেন, তা না হলে আবুল কালাম আজাদদের হাত থেকে মার্তৃভূমিকে রক্ষা করে আমরা নৈতিকতার সন্ধানের জন্য তাদের কাছেই ফিরে যাচ্ছি কেন? ধর্ম যতই নৈতিকতাকে ভাই বা অবিচ্ছেদ্য কেউ বলুক না কেন, নৈতিকতার চরম স্খলনে সর্বদাই সচেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে ধর্ম। পার্থক্য এই যে চরম স্খলনকেও ধার্মিকরা ভেবেছেন চরম ভালো কোনো কাজ হিসেবে। আমরা পুরো ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছি বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে বিজ্ঞানী স্টিফেন ভাইনবার্গের একটি চমৎকার উদ্ধৃতি দিয়ে-

> ধর্ম মানবতার জন্য এক নির্মম পরিহাস। ধর্ম মানুক বা নাই মানুক, সবসময়ই এমন অবস্থা থাকবে যে ভালো মানুষেরা ভালো কাজ করছে, আর খারাপ মানুষেরা খারাপ কাজ করছে। কিন্তু ভালো মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মের জুড়ি নেই।

ব্লগে লেখালেখি করতে গিয়ে ধর্মের কুফল নিয়ে আলোচনা শুরু করে অনেক ধার্মিকই নাস্তিকদের উদাহরণ হিসেবে হিটলার স্ট্যালিন, মাও কিংবা পল পটের মতো দাম্ভিক ডিক্টেটরের কথা নিয়ে এসে প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে সচেষ্ট হন। তারা হিটলার স্ট্যালিন প্রমুখের উদাহরণ টেনে বুঝিয়ে দিতে চান যে, ধর্মের মতো নাস্তিকতার কুফলও কম নয়।

5 মূল প্রতিবেদনের স্ক্যানড কপি রাখা আছে, http://www.somewhereinblog.net/blog/omipialblog/28734445

হিটলার এবং স্ট্যালিনের প্রসঙ্গে আসা যাক। হিটলার কখনোই নাস্তিক ছিলেন না। হিটলার নিজেই তার বই 'Mein Kampf'-এ বলেছেন তার ইহুদি নিধনের কিংবা এধরনের যাবতীয় কাজকর্মের পেছনে অনুপ্রেবণা ছিল স্বয়ং ঈশ্বর[6]-

> Hence today I believe that I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator: by defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord.

নিজেকে 'ভালো খ্রিস্টান' হিসেবে পরিচিত করে হিটলার তার বিভিন্ন বক্তৃতা দিয়েছেন। হিটলারের একটি বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করা যাক প্রাসঙ্গিক কিছু লাইন[7]-

> My feelings as a Christian point me to my Lord and Savior as a fighter. It points me to the man who once in loneliness, surrounded by a few followers, recognized these Jews for what they were and summoned men to fight against them and who, God's truth! was greatest not as a sufferer but as a fighter. In boundless love as a Christian and as a man I read through the passage which tells us how the Lord at last rose in His might and seized the scourge to drive out of the Temple the brood of vipers and adders. How terrific was His fight for the world against the Jewish poison. To-day, after two thousand years, with deepest emotion I recognize more profoundly than ever before the fact that it was for this that He had to shed His blood upon the Cross. As a Christian I have no duty to allow myself to be cheated, but I have the duty to be a fighter for truth and justice... And if there is anything which could demonstrate that we are acting rightly it is the distress that daily grows. For as a Christian I have also a duty to my own people.

প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান নেতা মার্টিন লুথারের ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষমূলক গ্রন্থ 'On the Jews and their Lies' যে হিটলারকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল, তাও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত[8]।

চিত্র- হিটলার এবং স্ট্যালিন কি সত্যই নাস্তিকতাবোধে উজ্জীবিত হয়ে তাদের অপরাধগুলো করেছিলো?

আর স্ট্যালিন নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের বিরোধী লোকজনের উপর খুন, জখম, জেল- জুলুম করেন নি, সেগুলো করেছিলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার নামে[9]। আর তারচেয়েও মজার ব্যাপার

---

6 Adolf Hitler, Mein Kampf, Houghton Mifflin, New York: Hutchinson Publ. Ltd., London, 1969, p 60.

7 Adolf Hitler, in a speech on 12 April 1922 (From Norman H. Baynes, ed. The Speeches of Adolf Hitler, April 1922-August 1939, Vol. 1 of 2, pp. 19-20, Oxford University Press, 1942)

8 www.nobeliefs.com/hitler.htm- এই সাইটে হিটলারের খ্রিস্টিয় বিশ্বাস এবং অনুপ্রেরণা নিয়ে বেশ কিছু ভাল আলোচনা রয়েছে।

9 যেমন, আইওয়া স্টেট রিলিজিয়াস স্টাডিজ এর অধ্যাপক হেকটর এভালজ তার Fighting Words: The Origins Of Religious

হলো, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে দাপ্তরিকভাবে ধর্মকে অস্বীকার করা হলেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্ট্যালিন রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। ইতিহাসবিদ এডভার্ড রেজিন্সকি (Edvard Radzinsky) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, স্ট্যালিনের সরকারের সাথে চার্চের সবসময়ই ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল[10]। এই সম্পর্ক এমনি এমনি তৈরি করা হয় নি, হয়েছিল এক শ্রেণীর মানুষকে চার্চের সহায়তায় দমিয়ে রাখার জন্য, যারা রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনার প্রতি চরম আনুগত্য প্রকাশ করে নি। শতবছর ধরে রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের সাথে যারিষ্ট সিক্রেট পুলিশের গোপন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, সুতরাং এটা অবাক হবার মতো কোনো ব্যাপার না যে, স্ট্যালিন এবং বর্তমান রাশিয়ার প্রধান সাবেক কেজিবি কর্মকর্তা ভ্লাদিমির পুতিন অর্থোডক্স চার্চকে হাতে রেখেছেন। এদের কাজের জন্য নাস্তিকতাকে দায়ী করা সমীচিন নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল, রিচার্ড ডকিন্স কিংবা স্টিফেন ওয়াইনবার্গ- এদের মতো ব্যক্তিত্বরাও নিজেদের 'নাস্তিক' হিসেবে পরিচিত করেন এবং নাস্তিকতা প্রচার করেন কোনো রকম রাখঢাক না রেখেই- কিন্তু কই তারা তো খুন রাহাজানি বা গণহত্যা করেন নি কিংবা করছেন না। নাস্তিকতা কোনো বিশ্বাসের ব্যাপার নয়[11]। নাস্তিকদের কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই, যেটা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন, তাই ধর্মগ্রন্থের প্রেরণায় লাদেন, স্ট্যালিন, হিটলার, আল-কায়দা কিংবা বজরংদলদের মতো নাস্তিকেরাও মানুষ হত্যায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবেন তা মনে করা ভুল। নাস্তিকদের ম্যানুয়ালে লেখা নাই 'যেখানেই পাও ইহুদি নাসারাদের হত্যা কর', কিন্তু বহু ধর্মের ম্যানুয়ালেই আছে। নাস্তিকেরা যে অপরাধ করেন না তা নয়, কিন্তু সেগুলো নাস্তিকতার কারণে করেন না, হয়তো করেন কোনো ব্যক্তিগত কারণে কিংবা কোনো রাজনৈতিক কারণে, নাস্তিকতার জন্য নয়।

হিটলার-স্ট্যালিনের ব্যাপারটা আরো সরলভাবে বোঝানো যায়। স্ট্যালিন এবং হিটলার দুজনেরই গোঁফ ছিল। এখন কেউ যদি যুক্তি দেন গোঁফ থাকার জন্যই তারা গণহত্যা করেছেন, কিংবা গোঁফওয়ালা ব্যক্তিরাই গণহত্যা করে- এটা শুনতে যেমন বেখাপ্পা এবং হাস্যকর শোনাবে, ঠিক তেমনি হাস্যকর শোনায় কেউ যখন বলেন, নাস্তিকতার জন্যই কেউ স্ট্যালিন বা হিটলারের মতো গণহত্যা করেছেন।

সেক্যুলারিজম মানে কি সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা?

এই গ্রন্থের দুই লেখককেই মুক্তমনাসহ অন্যান্য ব্লগে বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে লিখতে, আলোচনা করতে এবং বিতর্কে অংশ নিতে হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিও মাঝে মধ্যে চলে আসে। বিতর্ক করতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকেই যা শোনা যায় তা হলো, সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের মানে হচ্ছে সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা। এমন কি যারা ধর্ম মানেন না, এবং উদারপন্থী বলে কথিত তাদের অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে এভাবে দেখেন।

বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। সেক্যুলার শব্দের মানে কি সত্যিই সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা? অন্তত রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশ কিংবা ভারতের মতো দেশগুলোতে এখন তা-ই প্রচার করা হয়। বিভ্রান্তি সে কারণেই। আসলে কিন্তু 'সেক্যুলারিজম' শব্দটির অর্থ-'সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা' নয়, বরং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একটি মতবাদ, যা মনে করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক রাখা উচিত। আমেরিকান হেরিটেজ ডিকশনারিতে secularism শব্দটির সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে এভাবে-

> The view that religious considerations should be excluded from civil affairs or public education

---

Violence তার গ্রন্থে খুব পরিষ্কারভাবেই দেখাতে সমর্থ হয়েছেন যে, কোথাওই নাস্তিকতার জন্য স্ট্যালিন গণহত্যা করেন নি, করেছেন তার কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসপ্রসূত রাজনীতির (collectivization) কারণে।

10 Edvard Radzinsky, Stalin: The First In-depth Biography Based on Explosive New Documents from Russia's Secret Archives, Anchor, 1997

11 এ প্রসঙ্গে পড়ুন- এই বইয়ের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ নাস্তিকতাও একটি ধর্ম (বিশ্বাস) হলে…

এ সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ধর্মকে রাষ্ট্রের কাজের সাথে জড়ানো যাবে না- এটাই সেক্যুলারিজমের মোদ্দা কথা। ধর্ম অবশ্যই থাকতে পারে, তবে তা থাকবে জনগণের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে- 'প্রাইভেট' ব্যাপার হিসেবে; 'পাবলিক' ব্যাপার স্যাপারে তাকে জড়ানো যাবে না।

ভারত তার জন্মলগ্ন থেকেই 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করে এসেছে (যদিও ভারতের সংবিধানে 'অফিশিয়ালি' ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনেক পরে)। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু সেক্যুলারিজমের প্রকৃত সংজ্ঞা অনুধাবণ করতে পেরেছিলেন অনেক ভালোভাবে। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী থেকে ধর্মকে পৃথক রাখাই সঙ্গত মনে করতেন, জাতীয় জীবনে সব ধর্মের প্রতি উদাসীন থাকাটাই তার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হতো। তিনি বলতেন-

> ধর্ম বলতে যে ব্যাপারগুলোকে ভারতে কিংবা অন্যত্র বোঝানো হয়, তার ভয়াবহতা দেখে আমি শঙ্কিত এবং আমি সবসময়ই তা সোচ্চারে ঘোষণা করেছি। শুধু তাই নয়, আমার সবসময়ই মনে হয়েছে এ জঞ্জাল সাফ করে ফেলাই ভালো। প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধর্ম দাঁড়ায় ধর্মান্ধতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, মূঢ়তা, কুসংস্কার আর বিশেষ মহলের ইচ্ছার প্রতিভূ হিসেবে।

আমেরিকার 'ফাউন্ডিং ফাদার'দের মাঝে নেহেরুর অনুপ্রেরণা ছিল কিনা জানি না, তবে তারা আমেরিকার সংবিধান তৈরির সময় ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা রেখেছিলেন, খুব বলিষ্ঠ ভাবে[12]-

> **As the Government of the United States of America is not, in any sense, founded on the Christian religion**; as it has in itself no character of enmity against the laws, religion, or tranquility, of Musselmen; and as the said States never have entered into any war or act of hostility against any Mehomitan nation, it is declared by the parties that no pretext arising from religious opinions shall ever produce an interruption of the harmony existing between the two countries. (ref. The Treaty of Tripoli, drafted in 1796 under George Washington, and signed by John Adams in 1797)

আসলে অভিধানে secular শব্দটির অর্থও করা হয়েছে এভাবে- 'Worldly rather than spiritual'। সেক্যুলারিজমের অন্যান্য প্রতিশব্দগুলো হলো- worldly, temporal কিংবা profane। শব্দার্থগুলো খুব ভালোভাবে খেয়াল করলে বোঝা যাবে, এর অবস্থান ধর্ম কিংবা আধ্যাত্মিকতার দিকে নয়, বরং এর একশ আশি ডিগ্রি বিপরীতে। সেজন্য, সেক্যুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ অনেকে খুব সঠিকভাবেই করেন- 'ইহজাগতিকতা'।

অথচ সেই 'ইহজাগিতিক' ভারতেই রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ পঞ্চাশের দশকে ঘোষণা করলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় বরং সর্ব ধর্মের সহাবস্থান, এবং Hindu view of life এর কল্পিত ভাববাদী পূর্ণতায় তিনি আস্থাবান। 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়'– এই শ্লোগানটি বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী দল আওয়ামী লীগও খুব জোরেসোরে বলার চেষ্টা করে। তবে এ শ্লোগানটির মধ্যেই রয়েছে এক ধরনের 'শুভঙ্করের ফাঁকি'। এ ফাঁকিটি চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার 'ইহজাগতিকতার প্রশ্ন' প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে অভিজিৎ রায় আর সাদ কামালীর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত 'স্বতন্ত্র ভাবনা' (চারদিক, ২০০৮) বইয়ে-

> ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এই কথাটা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই খুব জোরেসোরে বলা হচ্ছে। কথাটা সত্য বটে আবার মিথ্যাও বটে। সত্য এ দিক থেকে যে, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নাগরিকদের এ পরামর্শ দেয় না যে, তোমাদের ধর্মহীন হতে হবে; কিন্তু তা বলে

12 আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদারদের প্রধান ছিলেন যারা তাদের অনেকেই আসলে ধর্মহীন নাস্তিক ছিলেন বলে অনেকে দাবি করেন। ক্রিস্টোফার হিচেন্স তার 'Thomas Jefferson: Author of America' বইয়ে দাবি করেছেন যে, জেফারসন সম্ভবত নাস্তিকই ছিলেন, এমন কি তার সময়েও, এবং প্রবলভাবেই। রিচার্ড ডকিন্সও তার God Delusion বইয়ে এমন ইঙ্গিত করেছেন। তবে নাস্তিক হোন বা না হোন আমারিকার ফাউন্ডিং ফাদারেরা যে সেক্যুলার ছিলেন, এটা তাদের বিভিন্ন লেখালেখি থেকে স্পষ্ট। পরবর্তীতে ফাউন্ডিং ফাদারদের আদর্শ থেকে আমেরিকার বিচ্যুতি প্রবলভাবে লক্ষ্যনীয়। আমেরিকার ডলারে লিখিত 'ইন গড উই ট্রাস্ট' এমন একটি উদাহরণ।

> এমন কথাও বলে না যে, রাষ্ট্র নিজেই সকল ধর্মের চর্চা করবে, কিংবা নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উৎসাহিত করবে। রাষ্ট্র বরঞ্চ বলবে ধর্মচর্চার ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিজের কোনো আগ্রহ নেই, রাষ্ট্র নিজে একটি ধর্মহীন প্রতিষ্ঠান।, ধর্ম বিশ্বাস নাগরিকদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্রের ওই ধর্মহীনতাকেই কিছুটা নম্রভাবে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা।

খুবই দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আউরে মুখে ফ্যানা তুলে ফেললেও তারা ধর্মনিরপেক্ষতার মূল সুরটি কখনোই অনুধাবন করতে পারে নি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় আওয়ামী লীগের ওয়েব সাইট (http://www.albd.org/) দেখলেই। আওয়ামী লীগের ওয়েব সাইটে মাথার উপরে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' লেখা বাণীটি তারই পরিচয় বহন করে। অথচ এক সময় আওয়ামী লীগই 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে মুসলিম শব্দটি উঠিয়ে দেবার সাহস দেখাতে পেরেছিল কিংবা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সেসময় রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে খুব স্বাভাবিক ছিল সে অঙ্গীকার। কিন্তু এর জন্য যে বিশাল সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি প্রয়োজন তা তাদের নেতাদের ছিল না, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তো ছিলই না।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করলেও এর মূল ভাবটি তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে স্পষ্ট ছিল- এমন কোনো নজির পাওয়া যায় নি। পাকিস্তানি কারাগার থেকে ঢাকায় ফিরে এসে রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বাংলাদেশকে 'দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন তা কম তাৎপর্যপূণ নয়। ওই বছরেরই সাতই জুন তারিখের বক্তৃতায় শেখ মুজিব ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যা বলেছেন তা হলো-

> বাংলাদেশ হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে, হিন্দু হিন্দুর ধর্ম পালন করবে। খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নেই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে।

এ বক্তৃতা থেকে মুজিবের 'সর্বধর্মের প্রতি সদ্ভাবের' সুর ধ্বনিত হলেও সেক্যুলারিজমের মুল সুরটি অনুধাবিত হয় নি। আর হয় নি বলেই, সেসময়কার সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদে 'ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ লোপ' করা হলেও, প্রবণতা দেখা দিলো রাষ্ট্র কর্তৃক সকল ধর্মকে 'সমান মর্যাদাদানের'। তাই বেতারে, টেলিভিশনে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে- সর্বত্র কোরান শরীফ, গীতা, বাইবেল আর ত্রিপিটক পাঠ করা হতে লাগলো এক সঙ্গে। এ আসলে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং ধর্ম আর শ্রদ্ধার মিশেল দেওয়া এক ধরনের জগাখিচুরি। সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে 'ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা'। যত দিন গেছে, ততই মুজিব এমন কি এই ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা থেকেও দূরে সরে গেছেন। তার শাসনামলের প্রান্তে প্রতিটি ভাষণেই মুজিব 'আল্লাহ', 'বিসমিল্লাহ', 'ইনশাল্লাহ', 'তওবা' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করতেন। এমন কি শেষদিকে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক প্রতীক 'জয় বাংলা'ও বাদ দিয়ে 'খোদা হাফেজ' প্রবর্তন করেন। শুধু তাই নয়, যে 'ইসলামিক অ্যাকাডেমি' মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার আলবদরদের সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, তারও পুনরুত্থান ঘটান মুজিব, এবং প্রতিষ্ঠানটিকে 'ফাউন্ডেশন'-এ উন্নীত করেন।

তাও কাগজে কলমে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংবিধানে যাওবা চালু ছিল মুজিবের সময়, জিয়াউর রহমান এসে তা মূল সুদ্ধ উপড়ে ফেললেন। ধর্মনিরপেক্ষতার উপরে কাঁচি চালিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' আর সমান বেগে মূলনীতি হিসেবে স্থাপিত হলো- 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা আর বিশ্বাস'কে। সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ-এর উচ্ছেদ হয়ে গেল। ১২ নং অনুচ্ছেদের উচ্ছেদের ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার সুযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো। এরশাদ সাহেব এসে তো ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্মই বানিয়ে দিলেন। এরপর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তো অচ্ছুৎ হয়েছেই, বরং পাল্লা দিয়ে শুরু হয়েছে ধর্মকে তোষণ করে চলার নীতি। বিগত জোট সরকারের আমলে ধর্মকে আর

মৌলবাদকে তোষণ করার ফলশ্রুতি স্বরূপ কীভাবে বাংলা ভাইয়ের উত্থান হয়েছিল, কীভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পরিকল্পিত ভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কীভাবে প্রতিটি জেলায়, সিনেমা হলে, মাজারে, উদীচির অনুষ্ঠানে বোমাবাজির মহড়া চালানো হয়েছিল তা আমরা সবাই দেখেছি।

জনগণকে ইহজাগতিকতায় উদ্বুদ্ধ করার কাজ অতীতের শাসকেরা করে নি, এখনকার শাসকেরাও করছেন না। 'মোহাম্মদ বিড়াল' নিয়ে আলপিন নাটক আর তার পরিসমাপ্তি বায়তুল মোকারমের খতিবের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার মহড়া আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। এতদিন রাষ্ট্রীয় বিবাদ-বিপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সংসদভবন, বঙ্গভবন এগুলো ছিল উপযুক্ত এবং নির্বাচিত স্থান। আমাদের অতি বুদ্ধিমান রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সেটিকে সংসদ ভবনের বদলে বায়তুল মোকারমের বৈঠকখানায় নিয়ে উঠালেন। পরে দেখলাম, 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' বাস্তবায়নের পরিবর্তে অর্ধশিক্ষিত, শিক্ষিত মোল্লাগোষ্ঠীকে তোষণ করে চললেন সেসময়কার শাসকেরা। দেখেছি 'ধর্মানুভূতিতে আঘাত' লাগার অজুহাতে ফেসবুক বন্ধের নাটক, এবং তারপর আবার জনদাবির মুখে খুলে দেয়ার নগ্ন তামাসা।

ভারতের অবস্থাও যে খুব ভালো তা বলা যাবে না। সেখানেও সেক্যুলারিজমের মূল সুরটি আত্মস্থ করার পরিবর্তে চলছে ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা জাহির করার মহড়া। এ প্রসঙ্গে প্রবীর ঘোষ তার 'সংস্কৃতি, সংঘর্ষ ও নির্মাণ' বইয়ে লিখেছেন-

> বিপুল প্রচারে সাধারণ মানুষ পরিচিত হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দের সাথে। জেনেছে, ধর্মনিরপেক্ষতা কথার অর্থ হলো- 'সব ধর্মের সমান অধিকার'। বিপুল সরকারি অর্থব্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের এই যে ব্যাখ্যা হাজির করা হচ্ছে এবং এরই সাথে সম্পর্কিতভাবে আমাদের দেশের মন্ত্রী, আমলা ও রাজনৈতিকেরা মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়ে বেড়াচ্ছেন, গুরুদোয়ারায় নতজানু হচ্ছেন, মসজিদে গির্জায় শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন। দেওয়ালী, ঈদ, বড়দিন ইত্যাদিতে রাষ্ট্রনায়কেরা বেতার, দূরদর্শন মারফৎ শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দিলে আয়কর থেকে রেহাইয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।
>
> সাধারণের ভালো লাগছে- 'সব ধর্মের সমান অধিকার' মেনে নিয়ে মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিকদের সমস্ত ধর্মের কাছে নতজানু হতে দেখে। উদার হৃদয়ের মানুষ হিসেবে নিজেদের ভাবতে ভালো লাগছে জনগণের- হুঁ হুঁ বাবা, আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। এখানে সব ধর্মই সমান অধিকার ও শ্রদ্ধা পায় মন্ত্রী আমলাদের। মন্ত্রীরা এরই মাঝে জানিয়ে দেন সমস্ত ধর্মের সমান অধিকার বজায় রাখতে, দেশের 'ধর্মনিরপেক্ষতার মশাল' জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
>
> 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটিকে নিয়ে কী নিদারুণভাবে অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে ভাবা যায় না। 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ কোনো পক্ষে নয়। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ তাই 'কোনো ধর্মের পক্ষে নয়'- অর্থাৎ, সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। Secularism শব্দের আভিধানিক অর্থ- একটি মতবাদ- যা মনে করে রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকা উচিত।
>
> কিন্তু এ কী! এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আমরা কী দেখাচ্ছি? সেক্যুলার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও এদেশে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কোনো প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাস করা হয় মন্ত্রোচ্চারণের প্রদীপ জ্বালিয়ে, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয় নারকোল ফাটিয়ে। রাজনীতির ব্যবসায়ীরা 'সেক্যুলারিজম'-এর নামে নানা ধর্মকে তোল্লাই দিয়ে সর্বধর্মের সমন্বয় ও সংহতির বাধা গৎই এতদিন বাজিয়ে এসেছেন।

কিন্তু এই ছদ্ম-নিরপেক্ষতা যে ভারতের কোনো উপকারে আসে নি ইতিহাস তার প্রমাণ। জাতিভেদ প্রথা, ধর্মীয় সংঘাত আর দাঙ্গা সে স্বরূপটিই আমাদের সামনে তুলে ধরে। শাহবানু মামলায় আমরা দেখেছিলাম কিভাবে ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী সরকারের তথাকথিত ভারতীয় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নতজানু হয়েছিলো ইসলামিক শরিয়ার কাছে। গুটিকয় মুসলিম মৌলবাদীদের আন্দোলনের চাপে তাদের ভোট ব্যাংককে অক্ষত রাখতে অসহায় শাহবানুর মানবাধিকার লংঘন করতে কার্পন্য করেনি সেসময়কার কংগ্রেস পার্টি। কিছুদিন আগে 'রাম জন্মভূমি'কে পুঁজি করে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, অযোধ্যায় নির্বিচারে মুসলিমদের হত্যা, গুজরাটে দাঙ্গা আর তার ফলে ধর্মান্ধ বিজেপির উত্থান আমাদের কাছে ঐ ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ উৎকটভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। গুজরাট দাঙ্গার পর অধ্যাপক জয়ন্তী প্যাটেল তার 'India: Gujarat riots- communalization of state and civic society' প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা খুবই তাৎপর্যপুর্ণ-

> Our interpretation of secular as SARVADHARMA-SAMABHAV, protecting every religion and their diverse mode of belief structure, their separate social and civil code, varied customs, mores and faiths, and even education system is not conducive in building an integrated national society or human identity. Our identity is basically communal and has proved to be an obstruction in building a nation- state. It is clear that in interpreting the meaning of the word secular we have disregarded the spirit of the enlightenment and renaissance which was instrumental in building a modern state and the civic society in the west. It seems that we have to interpret the correct meaning of the word secular in our law enforcement. The connotation of the word secular should mean negation of all religions (SARVADHARMA-ABHAV).

রেনেসাঁর মানব মুক্তি প্রয়াস কিন্তু তখনকার সময়ের গির্জাকেন্দ্রিক ধর্মের গোড়ামিকে উপেক্ষা করেই পরিচালিত হয়েছিল। সেক্যুলারিজম বলতে সেখানে সব ধর্মের সহাবস্থান বোঝানো হয় নি। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ ফ্রান্সকে ধর্মনিরপেক্ষ থাকার প্রেরণা যুগিয়েছে। আদি বসতি স্থাপনকারীদের ধর্মীয়ভাবে নিপীড়িত হবার অভিজ্ঞতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে কোনো বিশেষ ধর্মের পক্ষ নিতে দেয় নি। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের জীবনে মুক্তিযুদ্ধের মতো এত বড় সড় ঘটনা ঘটলেও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত তাৎপর্য আমরা চল্লিশ বছরেও অনুধাবন করতে পারলাম না। সনৎ কুমার সাহার একটি উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য-

> সেক্যুলারিজম বহু শতাব্দী ধরে (আমাদের উপমহাদেশে) যে ভাবে আচরিত এবং রূপান্তরিত হয়ে আসছে, 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে'ই যদি তার ঠিক বঙ্গানুবাদ বলে ধরে নেই, তবে শুধুমাত্র সব ধর্মের সহাবস্থানেই তার অর্থ পুরোপুরি ধরা পড়ে না। এ কথা সত্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতায় তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়; ধর্ম থেকে চিন্তার মুক্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষতা পূর্ণতা পায়।

ধর্ম থেকে চিন্তার মুক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে না হলেও, রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অন্তত জরুরি। ব্যাপারটি রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবেন, ততই মঙ্গল।

ধর্মহীন সমাজ

চরমপন্থী ধার্মিকরা প্রায় বলে বেড়ান নাস্তিকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সমাজের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিবে। বাংলাদেশের মোল্লারা ওয়াজ মাহফিলে জ্বালাময়ী কণ্ঠে ব্যাখ্যা করেন, ধর্মনিরপেক্ষতা কীভাবে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশকে। মার্কিন টেলিভাঞ্জেলিস্ট প্যাট রবার্টসন ধর্মহীন সমাজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'ফলাফল হবে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র কায়েম'। আমরা বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে ধর্মহীন সমাজ নিয়ে আমেরিকার এরকম কট্টরপন্থী লেখক লেখিকাদের মনোভাবের উল্লেখ করেছি। যেমন, এন কোলটার তার বই 'গডলেস' এ বলেন, যে সমাজ ঈশ্বরের মর্যাদা বুঝতে অপারগ সেই সমাজের গন্তব্য

দাসত্ব, গণহত্যা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতার দিকে। তিনি আরও বলেন, যে সমাজে বিবর্তন সাধারণের কাছে সত্য বলে গণ্য সেই সমাজে নৈতিকতার স্থান কবরে। ফক্স নিউজের জনপ্রিয় উপস্থাপক বিল ও'রেইলির উদ্ধৃতিও আমরা দিয়েছি যেখানে তিনি বলেন, যে সমাজ ঈশ্বরের ছায়াতলে থাকতে ব্যর্থ সেই সমাজে আছে শুধু 'নৈরাজ্য আর দুর্নীতি', যেখানে 'আইন অমান্যকারীরা ঘুরে বেড়ায় বহাল তবিয়তে'[13]।

ব্রিটিশ ধর্মবেত্তা কেইথ ওয়ার্ড বলেন, যে সমাজ প্রবল ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে সে সমাজ অনৈতিক, পরাধীন এবং অস্থিতিশীল[14]। দার্শনিক জন ডি. কাপুটো ঘোষণা করেন, ধর্মহীন মানুষ এবং ঈশ্বরকে ভালো না বাসা মানুষরা স্বার্থপর এবং অভদ্র, সুতরাং তাদের দিয়ে গড়া সমাজ ভালোবাসাহীন জঘণ্য স্থান[15]।

প্রত্যেকবারের মতো আবারও আমরা দেখতে পাই, ধার্মিকরা কেমন করে প্রমাণ অগ্রাহ্য করে, বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের বিশ্বাসের পক্ষে থাকেন। অন্ধবিশ্বাস আসলে এভাবেই কাজ করে। কোনো প্রমাণ গ্রাহ্য করে না, গ্রাহ্য করে না বাস্তবতা। আমরা সপ্তম অধ্যায়ে বহু জরিপ এবং পরিসংখ্যান হাজির করে দেখিয়েছি যে, এমন কোনো বৈজ্ঞানিক উপাত্ত বা ডেটা পাওয়া যায় নি যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চাইতে বেশি অপরাধপ্রবণ; বরং কিছু পরিসংখ্যান একেবারেই উল্টো সিদ্ধান্ত হাজির করেছে। বেশ কিছু দেশে চালানো বহু জরিপেই পাওয়া গেছে যে, সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ধর্মহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম, বিশ্বাসীদের মধ্যেই বরং অপরাধপ্রবণতা বেশি, হত্যা, খুন রাহাজানি এমন কি বিবাহবিচ্ছেদ থেকে শুরু করে শিশুনির্যাতনও। আজকে যেসব সমাজের অধিকাংশ ধর্ম থেকে মুক্ত, মুক্ত ঈশ্বর থেকে সেসব সমাজ ঘৃণ্য, জঘণ্য, হানাহানিতে পরিপূর্ণ তো দূরের কথা এগুলো পৃথিবীর অন্যতম সুখী, নিরাপদ, সফল সমাজ।

আমরা বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে সমাজবিজ্ঞানী ফিল যাকারম্যানের অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেছি। তিনি ২০০৫-০৬ সালে চৌদ্দমাস ধরে ডেনমার্ক ও সুইডেনে অবস্থান করে ধর্ম ও ঈশ্বর সংক্রান্ত বিষয়ে অসংখ্য মানুষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলাফল তিনি প্রকাশ করেন, তার ২০০৮ এর বই 'Society without God'- এ[16]।

তিনি ডেনমার্কের আরহাস শহরে প্রথমবারের মতো অবতরণের পর যাকারম্যান প্রথম যে জিনিসটা লক্ষ্য করেন তা হলোঃ পুলিশের অনুপস্থিতি। চারপাশ তাকিয়েও কোনো পুলিশের গাড়ি, মটরসাইকেল বা পায়ে হেঁটে টহলরত সৈন্য খুঁজে পেলেন না তিনি। টানা একত্রিশ দিন পর তার অপেক্ষার অবসান ঘটে, তিনি রাস্তায় দেখেন আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর এক সদস্যকে। সেই ২০০৪ সালে পুরো বছর জুড়ে প্রায় পঁচিশ লক্ষাধিক মানুষ বসবাসকারী মেট্রোপলিটন শহর আরহাসে সংগঠিত খুনের সংখ্যা ছিল এক।

বেশিরভাগ ড্যানিশ এবং সুইডিশ ধর্ম দ্বারা সংজ্ঞায়িত 'সিন' বা পাপ নামক কোনো ব্যাপারে বিশ্বাসী নন অথচ দেশ দু'টিতে অপরাধ প্রবণতার হার পৃথিবীর সকল দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন। এই দুই দেশের প্রায় কেউই চার্চে যায় না, পড়ে না বাইবেল। তারা কি অসুখী? ৯১ টি দেশের মধ্যে করা এক জরিপ অনুযায়ী, সুখী দেশের তালিকায় ডেনমার্কের অবস্থান প্রথম, যে ডেনমার্কে নাস্তিকতার হার মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা আশি ভাগ। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় মাত্র ২০ শতাংশের মতো মানুষ ঈশ্বরের বিশ্বাস করেন, তারা মনে করেন ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পরের জগতে। আর বাকিরা স্রেফ কুসংস্কার বলে ছুঁড়ে ফেলেছেন এ চিন্তা।

ঈশ্বরহীন এইসব সমাজের অবস্থা তবে কেমন? সমাজের অবস্থা মাপার সকল পরিমাপ- গড় আয়ু, শিক্ষার হার, জীবন যাপনের অবস্থা, শিশুমৃত্যুর নিম্নহার, অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা, লিঙ্গ সাম্যাবস্থা,

13 বইয়ের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

14 Keith Ward, In Defence of The Soul, Oneworld Publications , May 25, 1998

15 John Caputo, On Religion (Thinking in Action), Routledge, 2001

16 বইয়ের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্বাস্থ্যসেবা, দুর্নীতির নিম্নহার, পরিবেশ সচেতনতা, গরীব দেশকে সাহায্য সবদিক দিয়েই ডেনমার্ক ও সুইডেন অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে উপরে। তবে পাঠকদের আমরা এই বলে বিভ্রান্ত করতে চাই না যে, এইসব দেশে কোনো ধরনের সমস্যাই নেই। অবশ্যই তাদেরও সমস্যা আছে। তবে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য তারা যৌক্তিক পথ বেঁছে নেয়, উপর থেকে কারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না, কিংবা হাজার বছর পুরোনো গ্রন্থ ঘেটে সময় নষ্ট করে না।

যাই হোক, ইউরোপের ক্রমশ ধর্মহীনতার দিকে গমনের হার অসীম সময় পর্যন্ত চলবে না। ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের রাজনীতি ও সমাজনীতির গবেষক এরিক কফম্যান ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর জন্মহার পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন ধর্মহীনতার দিকে এই দেশগুলোর গমন চলবে মোটামুটি ২০৫০ পর্যন্ত, তারপর এটা আবার ঘুরে দাঁড়াবে এবং ২১০০ সালের মধ্যে আবার বর্তমান অবস্থায় ফিরে আসবে[17]। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত যে, নাস্তিকতার ভবিষ্যত নির্ভর করছে মূলত দু'টি বিষয়ের উপরঃ শিক্ষা এবং অর্থনীতি। যদি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জ্বালানী সমস্যা সঠিকভাবে সমাধান করা না হয় এবং যদি বর্তমান বিশ্বের ধনী দেশগুলো এই কারণে গরিবদেশের কাতারে নেমে আসে, যদি তাদের শিক্ষার হার নিম্নগামী হয়, তাহলে রাষ্ট্র হতে প্রথম যে জিনিসটি যাবে তা হলো, নাস্তিকতা। কিন্তু আমরা যদি ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এই সমস্যাগুলোর যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক সমাধান দিতে সক্ষম হই, যদি অধিকাংশের জন্য একটি সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা দান করতে পারি, তাহলে আর আমাদের অতিপ্রাকৃতিক কোনো স্রষ্টার দিকে মুখ করে থাকতে হবে না- যিনি আকাশ থেকে নেমে এসে সমাধান করে দিবেন, আমাদের সকল সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট এবং গ্লানির।

বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও মুক্তমনার আত্মপ্রকাশ

বাংলাদেশে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নাম সবাই কমবেশি জানেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি। দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে জাহানারা ইমাম ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন মৃত্যুবরণ করার পর থেকে বাংলাদেশে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রতি বছরই জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদক প্রদান করে থাকে। পদক থাকে দুটি। একটি দেওয়া হয় ব্যক্তিকে, আরেকটি দেওয়া হয় সংগঠনকে। ২০০৭ সালে জাহানারা ইমামের তেরতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্মারক সভায় ব্যক্তির জন্য বিবেচিত পদকটি পেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান সেনাপতি এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার। আর সংগঠনের পদকটি পেয়েছিল মুক্তমনা। পদকটি মুক্তমনার পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন অধ্যাপক অজয় রায়। পদকের স্মারক পত্রে বলা হয়েছে-

> বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মুক্তচিন্তার আন্দোলনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে 'মুক্তমনা' ওয়েবসাইট। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশে ও বিদেশে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে সেক্যুলার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণের পাশাপাশি তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করবার ক্ষেত্রে 'মুক্তমনা' ওয়েব সাইটের জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতা ও বিজ্ঞানী অধ্যাপক অজয় রায়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশের তরুণ মানবাধিকার কর্মীরা এই ওয়েব সাইটকে তাদের লেখা ও তথ্যের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করছেন। ২০০১ সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল 'মুক্তমনা' তখন নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনের পাশাপাশি আর্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে এসেছিল। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং ধর্ম-বর্ণ-বিত্ত নির্বিশেষে মানুষের

17 Eric Kaufmann, 'Sacralization by Stealth: Religion Returns to Europe', Riley Institute Public Lecture, Furman University, Greenville, SC.

> সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিশেষ অবদানের জন্য 'মুক্তমনা' ওয়েব সাইটকে 'জাহানারা ইমাম স্মৃতিপদক ২০০৭' প্রদান করা হলো।

বাংলাদেশে এর আগে কোনো ওয়েবসাইট জাহানারা ইমাম পদক পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে নি। স্মারকপত্রের প্রথম লাইনটি গুরুত্বপূর্ণ। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবারের পদক প্রাপ্তির বিবেচনায় মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার পাশাপাশি 'মুক্তচিন্তার আন্দোলন'কেও গুরুত্ব দিয়েছে।

তাহলে স্বভাবতই প্রশ্নটি এসে পড়ে- এই মুক্তচিন্তার আন্দোলনটি কী, কেন এটি অনন্য কিংবা নিজগুণে স্বকীয়? যে সমাজ আর সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা, তার সবটুকুই যে নির্ভেজাল তা বলা যায় না। এতে যেমন প্রগতিশীল বস্তুবাদী উপাদান রয়েছে, তেমনি রয়েছে আধ্যাত্মবাদ, বুজরুকি, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর অপবিশ্বাসের রমরমা রাজত্ব; রয়েছে অমানিষার ঘোর অন্ধকার। এই অন্ধকার সুদীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরায় আমাদের চিন্তা চেতনাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে এই 'চেতনার দাসত্ব' থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়- বরং বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার। রাহুল সাংকৃত্যায়ন একবার তার একটি লেখায় বলেছিলেন-

> মানুষ জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মঞ্চে ওঠাকে বিরাট হিম্মত মনে করে। সমাজের গোঁড়ামিকে ভেঙে তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মঞ্চে ওঠার চেয়ে ঢের বেশি সাহসের কাজ।

কথাটি মিথ্যে নয়। তাই ইতিহাসের পরিক্রমায় দেখা যায়, খুব কম মানুষই পারে আজন্ম লালিত ধ্যান ধারণাকে পরিত্যাগ করে স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে, খুব কম মানুষই পারে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। খুব কম মানুষের মধ্যে থেকেই শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে একজন আরজ আলী মাতুব্বর, প্রবীর ঘোষ, হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন কিংবা আহমেদ শরীফ। আমাদের শাসক আর শোষক শ্রেণী আর তাদের নিয়ন্ত্রিত বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা কখনোই চায় না জনগণ প্রথা ভাঙুক, কুসংস্কারের পর্দা সরিয়ে বুঝতে শিখুক, জানতে শিখুক অজ্ঞতা, শোষণ আর অসাম্যের মূল উৎসগুলো কোথায়। জনগণের 'জ্ঞান চক্ষু' খুলে গেলেই তো বিপদ, তাই না! আর সেজন্যই জনগণকে অন্ধকারে রাখতে চলে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরে ধর্মকে পরিবেশন, লাগাতার আধ্যাত্মবাদী প্রচারণা, পত্র-পত্রিকায় ঢাউস আকারে রাশিফল, সর্পরাজ এবং আধ্যাত্মবাদী গুরু আর কামেল পীরের বিজ্ঞাপন, মন্ত্রী আর নেতা-নেত্রীদের মাজার আর দরগায় সিন্নি দেওয়া অথবা নির্বাচন উপলক্ষ্যে হজে যাওয়া, মাথায় কালো পট্টি বাধা। মুক্তমনাদের লড়াই এই সামগ্রিক অসততার বিরুদ্ধে, অন্ধবিশ্বাস আর অপবিশ্বাসকে উস্কে দেওয়া এই সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে। এ লড়াই বৌদ্ধিক, এ লড়াই সাংস্কৃতিক। এ লড়াই সমাজকে প্রগতিমুখী করবার ব্রত নিয়ে সামগ্রিক অবক্ষয় আর অন্ধকার ভেদ করে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করবার লড়াই। এ লড়াই আক্ষরিক অর্থেই আমাদের কাছে চেতনামুক্তির লড়াই।

চিন্তার এ দাসত্ব থেকে মুক্ত করার লড়াইয়ের ময়দানটি একদিনে গড়ে উঠে নি। আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বাস এবং যুক্তির সরাসরি সংঘাতের ভিত্তিতে যে সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন ব্লগ কিংবা ফোরামগুলোতে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে, তা আমরা মনে করি প্রাচীনকালের ব্রাক্ষ্মণ-চার্বাকদের লড়াইয়েরই একটি বর্ধিত, অগ্রসর ও প্রায়োগিক রূপ। এ এক আভিনব সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাঙালির এক নবজাগরণ যেন। এ নবজাগরণকে রূপ দিতেই আবির্ভাব হয়েছিল মুক্তমনার, প্রথমে ফোরাম হিসেবে, পরে রূপ নিয়েছিল সামগ্রিক একটি ওয়েব এবং পরবর্তীতে ব্লগ-সাইটে। এর পরের কাহিনি তো ইতিহাস। মুক্তমনার অবদান যে কোথায় পৌঁছে গেছে তার উল্লেখ মেলে জাহানারা ইমাম পদকের স্মারক লিপিতে- 'দেশে ও বিদেশে তরুণ প্রজন্মকে সেক্যুলার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণের পাশাপাশি তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করবার ক্ষেত্রে মুক্তমনা ওয়েব সাইটের জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেছে।'

মুক্তমনার আত্মপ্রকাশের ইতিহাসটি ছোট করে জেনে নেয়া যাক। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০১ সালে প্রশ্ন আর তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা এবং ধর্মান্ধতা আর মৌলবাদের বিরুদ্ধে মুক্তমনার প্রথমিক লড়াই সূচিত হলেও পাশাপাশি সারা পৃথিবী জুড়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত মুক্তচিন্তাবিদদের সহযোগী মানবতাবাদী সংগঠন হিসেবে কাজ করার সচেতন প্রয়াস নেওয়া হয়। আসলে মানবিক দিকটি শুরু থেকেই মুক্তমনা কখনোই অগ্রাহ্য করে নি। আমরা খবর পাই পাকিস্তানে ইউনুস শায়িখ নামের এক চিকিৎসক ব্লাসফেমি আইনের শিকার হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। তার অপরাধ, তিনি শ্রেণীকক্ষে লেকচার দিতে গিয়ে নাকি ছাত্রদের বলেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ তার নবুওতপ্রাপ্তির আগ পর্যন্ত মুসলিম ছিলেন না। পাকিস্তানের মতো ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে ধর্ম এবং ধর্মপ্রচারক সম্পর্কে সামান্য বিপরীত কথাবার্তা সহ্য করা হয় না। শাস্তি একটাই, মৃত্যুদণ্ড। ইউনুস শায়িখ বন্দী হলেন এবং যথারীতি কারাগারে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। মুক্তমনা এই হতভাগ্য ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলো। আমরা পিটিশন আর প্রতিবাদলিপির বন্যায় পাকিস্তান সরকারের মেইলবক্স একেবারে ভর্তি করে ফেললাম। আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো আই.এইচ.ই.ইউ এবং জার্নালিস্ট ইনটারন্যাশনাল। আর অন্যদিকে ঢাকাতে ইউনুস শায়িখের মুক্তি এবং ব্লাসফেমি আইন বিলোপের দাবিতে দাবিতে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার হাতে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করলেন ডঃ অজয় রায়ের নেতৃত্বে অন্যান্য মুক্তমনা সদস্যরা। মুক্তমনার শুভানুধ্যায়ী এবং হোস্ট ডঃ অ্যালেন লেভিন চারিদিকে নেটওয়ার্ক তৈরি করে মানবতাবাদী সংগঠনগুলোকে উদ্বুদ্ধ ও এক ছাতার নিচে নিয়ে আসলেন। এমনিভাবে সারা বিশ্বব্যাপী মানবতাবাদীদের প্রবল চাপে পাকিস্তান সরকার একসময় গোপনে ডঃ শায়িখকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, ডঃ শায়িখও সাথে সাথে দেশত্যাগ করলেন। ডঃ শায়িখ ক'দিন পরেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে মুক্তমনাকে তার পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন। এরপর তিনি মুক্তমনায় যোগদান করেন এবং বেশ ক'বছর ধরেই মুক্তমনায় লিখছেন।

ডঃ শায়িখের প্রোজেক্টটি মুক্তমনার প্রথম দিককার অন্যতম সফল প্রোজেক্টগুলোর একটি। এটি সফল হওয়ায় আমাদের উৎসাহ অনেক বেড়ে যায়। আমরা ইতোমধ্যেই বহু জায়গায় পিটিশন করেছি। আমিনা লাওয়াল নামের এক মহিলাকে 'শারিয়ার রজম' থেকে বাঁচানোর জন্য মুক্তমনা উদ্যোগী হয়, এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়। তারপর থেকে মুক্তমনা আন্তর্জাতিকভাবে নানা ধরনের পিটিশন করেছে, আবেদন করেছে, কখনো প্যালেস্টাইনে নির্বিচারে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে, কখনো গুজরাতে গণহত্যার বিচারের দাবিতে, কখনোবা উপমহাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায়, কখনো আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা হামলার নিন্দা করে, কখনো ভারতে নদী সংযোগ প্রকল্পের বিরোধিতা করে, কখনো তথাকথিত 'বাংলা ভাই' কে গ্রেফতারের দাবিতে, কখনোবা কানসাটে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে।

বিগত ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে- যখন সংখ্যালঘুদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার নিপীড়ন শুরু হলো, তখন এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে সচেতনতা তৈরি করতে শুরু করেছিল এই মুক্তমনাই। আসলে শুধুমাত্র 'অত্যাচার' আর 'নিপীড়ন' বললে বোধহয় ভয়াবহতার মাত্রাটা বোঝা যাবে না। নিবাচনের পরবর্তী কয়েকমাসে ঠিক কী হয়েছিল, তা বোঝা যাবে গার্ডিয়ানে প্রকাশিত জন ভাইদালের 'Rape and torture empties the villages' (জুলাই ২১, ২০০৩) একটি প্রবন্ধ পড়ে নিলেই। প্রবন্ধটিতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে পূর্ণিমা রানীর মতো হতভাগ্যদের উপর সেসময় কীভাবে গণধর্ষণের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল। শুধু পূর্ণিমা রানীই একমাত্র শিকার নন, ভাইদালের মতে নির্বাচনোত্তর তিন মাসে ডজনকে ডজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, অন্তত এক হাজার মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে আর কয়েক হাজার লোকের জমি-জমা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এধরনের রিপোর্ট শুধু গার্ডিয়ানে বা হিন্দুস্থান টাইমসে নয়, পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছিল ডেইলি-স্টার, প্রথম-আলো, সংবাদ, জনকণ্ঠ, ভোরের-কাগজসহ দেশের সকল শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোতে। এমন কি মৌলবাদী আর সরকার সমর্থিত পত্রিকা ইনকিলাব আর সংগ্রামও একেবারে বাদ যায় নি। মুক্তমনার ঢাকা নিবাসী

সদস্যরা 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি'র ব্যানারে ভোলা জেলায় অন্নদাপ্রসাদ নামের একটি গ্রামে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিল। তবে পর্যবেক্ষণই শুধু উদ্দেশ্য ছিল না, সেইসাথে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল যারা সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের শিকার হয়েছে তাদের আর্থিক ও মানসিকভাবে সহায়তা প্রদান করা। আমরা দৃষ্টিপাত নামের একটি সংগঠনের সাথে মিলে অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের দশটি পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে সম্মত হই। সরকার পক্ষ থেকে আমাদের কাজকর্মকে ভালো চোখে দেখা হলো না। বক্তব্য দেয়া হলো এই বলে যে দেশের বাইরে এক 'বাংলাদেশ বিরোধী কুচক্রী মহল' দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়ে বেশ কিছু জ্বালাময়ী ভাষণও দিলেন। রটিয়ে দেয়া হলো যারা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে তারা হয় ভারতের 'র' এর এজেন্ট, নয়ত ইহুদিদের 'মোসাদ' এর আর নাহয় আমেরিকার সি.আই.এর! সেসময় অভিজিৎ রায় মুক্তমনায় 'যুক্তির আলোয় দেশের ভাবমুর্তি এবং দেশপ্রেম' নামের একটি প্রবন্ধ লেখেন, বাংলায়। সে প্রবন্ধে তিনি তুলে ধরেছিলেন দেশপ্রেমের যৌক্তিক সংজ্ঞা। তিনি বলেছিলেন, দেশ মানে দেশের মাটি নয়, দেশপ্রেম মানে কখনোই দেশের মাটির প্রতি বা প্রাণহীন নদী-নালা আর পাহাড়-পর্বতের জন্য ভালোবাসা হতে পারে না। দেশপ্রেম মানে হওয়া উচিত দেশের মানুষের প্রতি প্রেম; লাঞ্ছিত, বঞ্চিত অবহেলিত গণ-মানুষের প্রতি ভালোবাসা। রাষ্ট্রের একটি প্রধানতম উপাদান হলো জনসমষ্টি। এই জনসমষ্টিকে বাদ দিয়ে শুধু কতকগুলো প্রাণহীন নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত আর মাটির প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টিকে আর যা-ই বলা হোক, 'দেশপ্রেম' বলে অভিহিত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। উদ্ধৃতি হাজির করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের, আইন্সটাইনের আর হাল আমলের যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের; দেখিয়েছিলেন দেশপ্রেমও শেষ পর্যন্ত কিন্তু একটা ডগমাই। মুক্তমনার অন্যান্য সদস্যরাও এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করেছেন। দেশপ্রেম নিয়ে মুক্তমনাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সেসময় সচেতন মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিলেন, কোনো সরকারের অন্ধ আনুগত্যই দেশপ্রেম নয়। দেশে অরাজকতা, হত্যা নিপীড়নের কাহিনি যেকোনো মূল্যে কার্পেটের নিচে পুরে রেখে দেশকে আকাশে তুলে রাখার নামই দেশপ্রেম নয়, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের বিবেক জাগিয়ে তোলাটাও দেশপ্রেমের অংশ। সংকীর্ণ দেশপ্রেমের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তিবাদী দৃষ্টি দিয়ে 'দেশের ভাবমূর্তি' দেখবার এই মানসিকতার উত্তোরণ একদিনে হয় নি। এর কৃতিত্ব মুক্তমনারা দাবি করতেই পারেন।

মুক্তমনার সবচাইতে বড় অবদান সম্ভবত ইন্টারনেটে (এবং পরবর্তীতে প্রিন্টেড মিডিয়ায়) বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার প্রসার। অভিজিৎ রায়ের 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' সে উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল, পরে এটি বই হিসেবে বেরোয় ২০০৫ সালে। বন্যা আহমেদর 'বিবর্তনের পথ ধরে' সিরিজটিও বই হিসেবে বেরিয়েছে (২০০৭), সেইসাথে বেরিয়েছে 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' (২০০৭)। এছাড়া আরো বেরিয়েছে 'স্বতন্ত্র ভাবনাঃ মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি' (২০০৮), এবং 'সমকামিতাঃ বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান' (২০১০)। প্রতিটি গ্রন্থের উদ্দেশ্য একই। বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার ও প্রসার। বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে লিখছেন ফরিদ আহমেদ, শাফায়েত, সিদ্ধার্থ, অপার্থিব, মেহুল কামদার, মীজান রহমান, অনন্ত, তানবীরা, জাহেদ আহমেদ, জাফর উল্লাহ, অজয় রায়, বিপ্লব পাল, প্রদীপ দেব, আবুল কাশেম, আকাশ মালিক, শিক্ষানবিস, রৌরব, তানভীরুল, পৃথিবী, ইরতিশাদ আহমদ, সংশপ্তক, স্নিগ্ধা এবং আরো অনেকেই। এ লেখকদের থেকেই উঠে এসেছে 'যুক্তি'র মতো ম্যাগাজিন, নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 'মুক্তান্বেষা' এবং 'মহাবৃত্ত'। এই 'বিজ্ঞানমনস্কতা' ব্যাপারটি আমাদের কাছে সবসময়ই ভিন্ন অর্থ বহন করে। 'বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার' বলতে আমরা এটি বোঝাই না যে গ্রামে গঞ্জে বিদ্যুৎ পৌঁছিয়ে দেওয়া কিংবা উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা। ওগুলোর প্রয়োজন আছে কিন্তু তা করার জন্য রাষ্ট্র এবং সরকারই আছেন। আমরা বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার বলতে বোঝাই কুসংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানমুখী সমাজ গড়ার আন্দোলন। ঢাকা কলেজের প্রিয় শিক্ষক আবদুল্লাহ আবু সাইদের ভাষায় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে 'আলোকিত মানুষ' গড়ার

আন্দোলন। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই সে 'বিজ্ঞানমনস্ক' হয় না, হয় না আলোকিত মানুষ। তাই দেখা যায় এ যুগের অনেকেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেও বা বিজ্ঞানের কোনো বিভাগকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেও মনে প্রাণে বিজ্ঞানী হতে পারেন নি, পারেন নি মন থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে। বাংলাদেশের এক বিখ্যাত 'ইসলামি পদার্থ বিজ্ঞানী' আছেন যিনি একবিংশ শতাব্দীতে এসেও শতাব্দী প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'আধুনিক বিজ্ঞানের' সন্ধান পান, মহানবীর মিরাজকে 'আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি' দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চান। ভারতের এক স্বনামধন্য বিজ্ঞানী আবার বেদ আর গীতার মধ্যে 'বিগব্যাঙ' আর 'টাইম-ডায়ালেশন' খুঁজে পান। এরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন ঠিকই, চাকুরি ক্ষেত্রে সফলতাও হয়তো পেয়েছেন, কিন্তু মনের কোনে আবদ্ধ করে রেখেছেন সেই আজন্ম লালিত সংস্কারগুলো, আঁকড়ে ধরে রেখেছেন যুক্তিহীন ধর্মীয় ধ্যান ধারণা। এই 'বিজ্ঞানী' তকমাধারী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোই বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে সবচেয়ে বড় বাধা। বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী 'বিজ্ঞানী' নামধারী মানুষগুলোর কুসংস্কারের সাথে যেমন আমরা পরিচিত হয়েছি, ঠিক তেমনি আমাদের দেশে আরজ আলী মাতুব্বর বা রঞ্জিত বাওয়ালীর মতো স্বল্পশিক্ষিত, ডিগ্রিহীন, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী মনমানসিকতার নির্লোভ মানুষও আমরা দেখেছি। এরাই আমাদের শক্তি।

মুক্তমনাদের বিরুদ্ধে কারো কারো একটি অভিযোগ মুক্তমনারা দেশের মানুষের জন্য খুব বেশি কিছু করে না, যতটা না ঈশ্বর, আধ্যাত্মিকতার বিরোধিতা কিংবা ডারউইন ডে উদযাপনে ব্যয় করে। এধরনের অভিযোগ যারা করেন তারা ভুলে যান এ ক'বছরে মুক্তমনাদের সফল প্রোজেক্টগুলোর কথা। হ্যাঁ, মুক্তমনা ঘটা করে ডারউইন ডে, হিউম্যানিস্ট ডে, র‍্যাশনালিস্ট ডে, আর্থ ডে ইত্যাদি পালন করেছে ঠিকই, কিন্তু যখন প্রয়োজন হয়েছে দেশের মানুষের প্রয়োজনে মুক্তমনা সচেতনভাবেই এগিয়ে এসেছে। অধ্যাপক অজয় রায় সেকথাগুলোই শুনিয়েছেন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জাহানারা ইমাম স্মারক সেমিনারেঃ[18]

আমরা শুধু ধর্মান্ধতা আর মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি শোনাই না, আমরা মানবতার সপক্ষে লড়াইয়ে নামি-

> ১. ব্লাসফেমির বিরুদ্ধে মানবতাকে বাঁচাতে পাকিস্তানের কারাদণ্ড প্রাপ্ত ফ্রিথিঙ্কার ড. ইউনুস শাইখকে বাঁচাতে বিশ্বময় আন্দোলন গড়ে তুলি। আমাদের সক্রিয় সহযোগী ছিল 'IHEU, Rationalist International, Amnesty International, Dhaka Rationalist and Secularist Union' এবং ঢাকার মুক্তমনাদের 'Save Dr. Yunus Shaikh Committee', যারা রাস্তায় নেমে দিনের পর দিন আন্দোলন, মিটিং, মিছিল, সেমিনার, পথসভা ও পাকিস্তানি দূতাবাসের সামনে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন কবির চৌধুরী, বিচারপতি আবদুস সোবহানসহ দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও প্রগতির পক্ষের মানুষ।
> আমাদের সাফল্য এসেছিল। পাকিস্তান সরকার তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যে রয়েছেন এবং আমাদের একজন সক্রিয় সদস্য।
>
> ২. আমরা আন্দোলন গড়ে তুলি শাহরিয়ার কবিরের পক্ষে তার মুক্তির লক্ষ্যে, যখন খালেদা নিজামী সরকার তাকে বিমান বন্দরে গ্রেপ্তার করে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে। আমরা সফল হই তাকে মুক্ত করতে দেশে বিদেশে গড়ে ওঠা সফল আন্দোলনের গড়ে তোলার মাধ্যমে।
>
> ৩. পরে দ্বিতীয়বার শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুন ও সাংবাদিকসহ অনেক অবরুদ্ধ অত্যাচরিত ব্যক্তিদের পক্ষে মানবতার মুক্তির পক্ষে আন্দোলনে নামি এবং এখানেও আমরা সফল হই।

18 জাহানারা ইমাম স্মারক সভায় ড. অজয় রায়ের বক্তৃতা http://www.mukto-mona.com/award/award_ajoy_unic.htm

৪. আমরা এককভাবে 'প্রশিকার পক্ষে' নেটওয়ার্কে আন্দোলন গড়ে তুলি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায়। প্রশিকা মহাপরিচালককে মুক্তি দিতে বাধ্য হন সরকার।

৫. আমরা সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন প্রকাশ সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বদাই উচ্চকণ্ঠঃ আমরা মৌলবাদীদের হাতে মুসলমান বা হিন্দু যে-ই নির্যাতিত হয়েছে তার পক্ষে দাঁড়িয়েছি, মৌলবাদী সম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি আমাদের সীমিত শক্তি নিয়ে। গুজরাটে আহমেদাবাদের জিঘাংসা বৃত্তিকে আমরা ধিক্কার জানিয়েছি। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তাকে অপসারণের দাবিতে আমরা ভারতীয় প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি ও প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছি, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে একসাথে কাজ করেছি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে।

৬. একইভাবে ২০০১ সালে খালেদা-নিজামীর লেলিয়ে দেয়া সাম্প্রদায়িক শক্তি— বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর হত্যা, লুণ্ঠন, ঘরবাড়িতে অগ্নি সংযোগ, উপাসনালয় ধ্বংস ও অপবিত্রকরণের যে ঘৃণ্য নিদর্শন স্থাপন করেছে তার বিরুদ্ধে দেশের সেক্যুলার শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় রায় অন্যান্য মুক্তমনা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি'র ব্যানারে। তারা গঠন করেছিলেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে 'গণ তদন্ত কমিশন', যার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২০০২ এর ডিসেম্বরে এবং তাৎক্ষণিকভাবে অমাদের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়[19]। প্রবাসী মুক্তমনার সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে চালিত নির্যাতন বন্ধের দাবিতে। তারা ঘৃণা প্রকাশ করেছেন মৌলবাদী শক্তিকে সরকার প্রশ্রয় দেয়ায়।

৭. আমরা শুধু তাত্ত্বিক আন্দোলন করি না। আমরা আর্তমানবতার পাশে পার্থিবভাবেই এগিয়ে আসি। (ক). সাম্প্রদায়িকভাবে নির্যাতিত ভোলার অন্নদাপ্রসাদ ও ফাতেমাবাদ গ্রামে ১০০টি পরিবারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছি 'দৃষ্টিপাত' নামক আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পাশে। এই প্রকল্পে ১০০টি ঘরবাড়ি নির্মাণ, জমি ক্রয় করে দেয়া, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যয় ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে আমরা সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আমরা এসে দাঁড়িয়েছিলাম পূর্ণিমার পাশে, রিতার পাশে, মাধুরীর পাশে, রাজকুমার বাবুর পাশে, নরহরি কবিরাজের পাশে, জনের পাশে, সিতাংশু মরমুর পাশে, ফাতেমার পাশে, মিনতির পাশে ... এরা সবাই নরপশুদের পাশবিক অত্যাচারের শিকার।

৮. আমরা সাংবাদিক মানিক সাহার পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, তার দুটি কন্যার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছি। সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের পাশে দাঁড়িয়েছি।

৯. দুর্ঘটনা কবলিত মানবতাবাদী শাহরিয়ার কবির, কাজী মুকুল ও তাদের সহকর্মীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি যৎসামান্য শক্তি নিয়ে, আমরা ইসলামি মৌলবাদের শিকার হুমায়ুন আজাদের অসহায় পরিবারের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছি। হুমায়ুন আজাদ ফাউন্ডেশন গড়ে তুলতে সাধ্যমতো সহায়তা করেছি।

১০. ব্রহ্মপুত্রের চরে বন্যাবিধ্বস্ত একটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল আমরা পুনঃনির্মাণ করেছি, এবং আমরা এর পরিচালনার দায়ভার গ্রহণ করেছি। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ গড়ে তোলার প্রকল্প গ্রহণ করেছি এবং সে উপলক্ষ্যে কয়েক হাজার স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধার সম্মেলন করেছি এবং স্মৃতিস্তম্ভের শিলান্যাস করেছি।

19 http://www.mukto-mona.com/human-rights/report.htm দ্রষ্টব্য।

১১. চোলেশ রিছিলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে পিটিশন করেছি, তার পরিবারকে আর্থিকভাবে যথাসম্ভব সাহায্য করেছি।

১২. আমরা পিটিশন করেছি, বক্তব্য রেখেছি কিংবা জনসংযোগ করেছি ভারতে অবৈধ নদী-সংযোগের প্রতিবাদে, গুজরাটে মুসলিম জনগণকে নির্বিচারে হত্যার প্রতিবাদে, কানসাটে নিষ্ঠুরভাবে কৃষক-বিদ্রোহ দমনের প্রতিবাদে, জাফর ইকবাল এবং হাসান আজিজুল হককে সাম্প্রদায়িক মহল থেকে মৃত্যু-হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে, সি.আর.পি-এর প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালেরি টেলরের অপসারণের প্রতিবাদে, কিংবা সালমান রুশদি অথবা তসলিমা নাসরিনের উপর ফতোয়ার প্রতিবাদে।

এগুলো কি দেশের মানুষের জন্য করা নয়? আত্মপ্রচারণার সুর ধ্বনিত হলেও, আমরা বিনীতভাবেই বলতে চাই মুক্তমনা উপরের সবগুলো কাজই সাফল্যের সাথে করেছে। অতি সম্প্রতি আমরা অসুস্থ প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক নির্মল সেনের চিকিৎসার জন্য যথাসম্ভব সাহায্য করেছি[20]। সাহায্য করেছি কার্টুনিস্ট আরিফের মায়ের চিকিৎসার জন্যও[21]। তারপরও একটি বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যারা যুক্তিবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের চেতনামুক্তি আর সেই পথ ধরে শোষণমুক্তির স্বপ্ন দেখেন তাদের কিন্তু একটা বিষয়ে সচেতন থাকতেই হবে। উপলক্ষ্য যেন লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে না যায়। কুসংস্কার মুক্তির লক্ষ্যে পৌছুতে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম কেবল উপলক্ষ্যই হতে পারে, এ বিষয়ে অতি সচেতনতার প্রয়োজন। স্পষ্ট মনে রাখতে হবে এই সত্যটি- জনসেবা করে আর যা-ই করা যাক, সমাজ ব্যবস্থা পাল্টানো যায় না, সার্বিক শোষণ মুক্তি ঘটতে পারে না। শোষণ মুক্তি ঘটতে পারে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সচেতনতাবোধ থেকে। সচেতনতাবোধ যেন তৈরি না হয় সে জন্য শোষিতের ক্ষোভ ভুলিয়ে রাখে শাসকশ্রেণী। গরীবের ক্ষোভ ভুলিয়ে রাখতে ধনীর অর্থে চলে 'দরিদ্র নারায়ণ সেবা।' দরিদ্র-নারায়ণের সেবাই যাদের কেবল লক্ষ্য তারা আসলে কখনোই চায় না সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর হোক, কেন না দারিদ্র্য দূর নয়, বরং দারিদ্র্যকে পুঁজি করে জনগণের 'মগজ ধোলাই'ই তাদের অন্যতম লক্ষ্য। এধরনের সেবামূলক কাজে দুয়েকটি দরিদ্রের তাৎক্ষণিক লাভ হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জন্য পড়ে থাকে অনন্ত বঞ্চনাময় জীবন। অর্থনৈতিকভাবে দেশকে স্বাবলম্বী করার চাইতে মগজ ধোলাই করে জনচিত্ত জয় করার পদ্ধতিটি সফলভাবে কাজে লাগায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। সেজন্যই মাদার তেরেসা, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবা সংঘ, তবলীগ জামাত ইত্যাদি নানা সংগঠন নানা কৌশলে জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে নিজেদের জড়িত রেখেছে। গড়ে উঠেছে ইসলামি এনজিও। কৌশলে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ঠিকমতো দান খয়রাত করলে, যাকাত দিলে দারিদ্র্য নাকি সমাজ থেকে এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। কিন্তু ইতিহাস বলে অন্য কথা। এধরনের দান খয়রাত, যাকাত আর সমাজ সেবার মাধ্যমে সমাজের শোষণ মুক্তি ঘটেছে এমন একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসে নেই। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, সেবা সংঘ, তবলীগ জামাত, হাজারটা মাদার তেরেসা, হাজী মুহাম্মদ মহসিন বাংলাদেশের কিংবা ভারতের জনতার শোষণ মুক্তি ঘটাতে পারবে না। আমরা সমাজসেবার বিরুদ্ধে নই, কিন্তু 'উদ্দেশ্যমূলক' জনসেবার মাধ্যমে মগজ ধোলাই করে মানুষকে অন্ধ রাখার অভিসন্ধির বিরুদ্ধে।

মুক্তমনাদের বিরুদ্ধে আরেকটা অভিযোগ মুক্তবুদ্ধি, নাস্তিক্যবাদ, মানবতাবাদ এগুলোর চর্চা করে

20 অজয় রায়, আমার বন্ধু নির্মল সেনঃ স্বস্তিতে নেই (সাহায্যের আবেদন- পে প্যাল আপডেট)- নির্মল সেনের সাহায্যের এই আবেদনটি মুক্তমনায় প্রচারিত হবার পরে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। ফলে আমরা খুব কম সময়ের মধ্যেই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ১০০০ ডলার তোলার লক্ষ্য পূরণে সফল হয়েছিলাম।

21 'আদিল মাহমুদ, একটি মানবিক আবেদন- একজন মা'- আমরা মুক্তমনার পক্ষ থেকে প্রায় বারো দিন ব্যাপী ফান্ডরেইজিং শেষে আরিফের মায়ের চিকিৎসার জন্য ১৭২৫.০৩ $ USD সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলাম।

তারা গণবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। এর জবাবে প্রবীর ঘোষের মতো বলা যায়, যেকোনো অসুস্থ সমাজে সুস্থ সচেতন, যুক্তিবাদী মানুষ বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে গ্যালিলিও, প্যারাসেলস, ব্রুনো, বিদ্যাসাগরসহ বহু চিন্তাবিদের নাম উল্লেখ করা যায় যারা প্রত্যেকেই ছিলেন সমাজে একাকী। একাকী ছিলেন আরজ আলী মাতুব্বর বা আহমেদ শরীফও। কিন্তু এইসব বিদ্রোহী মানুষগুলো প্রথাগত স্থবিরতাকে চূর্ণ করতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, সেসময়কার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে। সেকালের বিচ্ছিন্ন বিশাল ব্যক্তিত্বদের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা ছিল না তৎকালীন মানবগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের এবং মগজ বেঁচা বুদ্ধিজীবী তকমাধারীদের। আজ সেসব বিচ্ছিন্ন মানুষেরাই হয়ে উঠেছেন এক একজন মহামানব, শ্রদ্ধা, আদর্শ ও প্রেরণার উৎস। যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ পঁচনধরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সংস্কারমুক্ত করা, যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ শোষণের অবসানমুখী সংগ্রাম, যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে সুস্থ সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে আনা, সে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই কাম্য। একটা সময় আমরা দেখেছি ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদের বিকাশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা একে একে দেখেছি ভারতীয় লোকায়াত বা চার্বাক দর্শন, গ্রিসের আয়োনিয়ার বস্তুবাদী দর্শন, পশ্চিম এশিয়ার মুসলিমদের মোতাজিলা দর্শন, ইউরোপের দার্শনিকদের (বেকন, লক, হবস, হিউম প্রমুখ) ইহজাগতিক দর্শন, ফরাসি বিপ্লব, ইউরোপের রেনেসাঁ এবং উনিশ শতকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিওদের কল্যাণে বাঙালিদের নবজাগরণ; আমরা সেই ঐতিহ্যের অনুসারী, জাতীয়ভাবে আমরা সহজিয়া, বাউলিয়ানার মতো বিভিন্ন অজ্ঞেয় লোকজ মতবাদ, বিভিন্ন সমমনা ইহজাগতিক সংগঠন ও ব্যক্তির যুক্তিবাদী ভাবধারার উত্তরসূরী। ডঃ অজয় রায়ও ঠিক সেকথাই বলেছেন জাহানারা ইমাম স্মরণ সভায়-

> আমরা বিংশ শতাব্দীর বাংলার উদারচেতা পুনর্জাগরণের উত্তরসূরী, ডিরোজিওর চিন্তা চেতনার অনুসারী, আমরা মনে করি শিখা গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের ধারক 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ঠ, মুক্তি সেখানে অসম্ভব', আমরা আরজ আলী মাতুব্বরের আদর্শের সৈনিক, আমরা বেগম রোকেয়া, লীলা রায়, ফুলরেনু গুহের, সুফিয়া কামালের, জাহানারা ইমামের পথে চলতে প্রত্যয়দীপ্ত....।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, কুপমণ্ডূকতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিনিষ্ঠ এক প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি ভারতে প্রবীর ঘোষের নেতৃত্বে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' সেদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। তার সুযোগ্য নেতৃত্বেই 'যুক্তিবাদী' চিন্তা আজ সেখানে ব্যক্তিগণ্ডি অতিক্রম করে আন্দোলনের রূপ পেয়েছে। আন্দোলিত হয়েছে লক্ষ-কোটি মানুষ, আন্দোলিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাট্য সংস্থা, বিজ্ঞান ক্লাবসহ বহু সংগঠন; এরা অংশ নিয়েছে যুক্তিবাদী চিন্তার বাতাবরণ সৃষ্টিতে। প্রত্যাশা বেড়েছে অনেক। তৈরি হয়েছে নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। ইন্টারনেটে তৈরি হয়েছে বহু ব্লগ সাইট। আমাদের দেশে 'বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ', 'জনবিজ্ঞান আন্দোলন', 'মুক্তচিন্তা চর্চা কেন্দ্র', 'বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল, সিলেট', 'বাংলাদেশ যুক্তিবাদী সমিতি'-বিভিন্ন নামে সংগঠন গড়ে উঠেছে প্রায় একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে। কুসংস্কার, ভাববাদ, আধ্যাত্মবাদ, নিয়তিবাদ ও অলৌকিকতা-মুক্ত এক আলোকিত বাঙালি প্রজন্ম গড়ে তুলতে অবদান রেখে চলেছে 'মুক্তমনা'। এদের কারণেই আজকে আমাদের এত বড় প্রাপ্তি। জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদক প্রাপ্তির মতো বিরল সম্মান অর্জন। আমরা আর কোনো বাঙালি ওয়েব সাইট বা ফোরামের খবর জানি না, যারা সাম্প্রতিক সময়ে এমন সম্মান অর্জন করে নিতে পেরেছে। মুক্তমনা আজ শুধু একটি ব্লগ সাইট নয়, এটি একটি সফল আন্দোলনের নাম। মুক্তমনা শব্দটির ব্যাপ্তি আজ এতই গভীরে, যে বিভিন্ন ফোরাম এবং ব্লগ সাইটে সমমনা প্রগতিশীল লেখকদের আজ 'মুক্তমনা লেখক' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

নতুন দিনের নাস্তিকতাঃ নেতৃত্ব দিচ্ছেন ব্লগাররা

শুধু মুক্তমনাতেই নয়, আজকে যেকোনো বাংলা ব্লগে গেলেই মুক্তবুদ্ধির লেখা সমৃদ্ধ বহু প্রবন্ধ চোখে পড়ে। বহু লেখকই ধর্মকে ক্রিটিক্যালি দেখছেন এবং লিখেছেন। আজকে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে- তথ্য যেখানে মুক্ত, সেখানে সত্যিটা যাচাই করে নেয়া অনেক সহজ। এই কিছুদিন আগেও তথ্যের অবাধ প্রবাহ যখন রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল তখন এইভাবে বিভিন্ন সাইটে এত বেশি মুক্তবুদ্ধির লেখা সমৃদ্ধ রচনা আমরা দেখি নি।

শুধু ব্লগ কেন, পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যাবে, বহু দেশেই বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে লোকজন এখন ধর্মের ধারই ধারে না। চার্চগুলো খালিই পড়ে থাকে। অনেকেই মনে করেন, নাস্তিকতাকে ধর্ম হিসবে দেখলে 'ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং রিলিজিয়ন' সম্ভবত ধর্মহীনতার দিকেই রায় দিবে[22]। ছোটবেলা থেকে মগজ ধোলাইয়ের মতো স্রেফ পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম বিশ্বাসটা মাথায় জোর করে ঢুকিয়ে না দিয়ে পরিণত বয়সে এসে 'সবকিছু দেখে শুনে, যাচাই বাছাই করে' ধর্মকে গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হলে আমরা বহু ধার্মিককে নাস্তিক হিসেবে দেখতে পেতাম- এটা সত্যিই বলা যায়।

আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং মানবতা শিশুকাল অতিক্রম করে গেছে বহু আগেই। এখন আর আমরা রূপকথার কল্পিত পরম পিতা নিয়ে মোহিত নই, যে পরম পিতা 'ডাবের ভিতর পানি কেন' থেকে শুরু করে বিগব্যাঙ কিংবা ব্ল্যাকহোল পর্যন্ত সবকিছুর পেছনেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসেবে হাজির হবেন আর আমাদের প্রয়োজনের অলীক ত্রাণকর্তা হিসেবে নিজেকে পরিচিত করবেন। সময় এগিয়েছে অনেক, আমরা নিজেরাই এখন নিজেদের দায়িত্ব নিতে সক্ষম, মানুষ নিজেই আজ নিজের ভাগ্যবিধাতা। আমরা আর রূপকথার জাল বুনে নিজেদের প্রবোধ দিতে চাই না, বরং বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এখন জীবন সাজাতে চাই। অন্যদিকে ধর্মগুলো এখন প্রগতির অন্তরায়, বিজ্ঞানের অন্তরায়, নারীমুক্তির পথে প্রধান বাধা। ধর্মগুলো নৈতিকতার নামে পুরোনো আমলের রদ্দিমার্কা জিনিস শেখাতে চায়। মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে ভুল ধারণা দেয়, বিজ্ঞানের নানান অপব্যাখ্যা হাজির করে। আর জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ, জাতিভেদ, নিম্ন বর্ণের উপর অত্যাচার কিংবা নারীদের অন্তরীণ রাখার বৈধতা- এগুলো তো আছেই। এগুলোকে 'না' বলার মাধ্যমেই প্রগতিশীল সমাজ গঠন সম্ভব, সম্ভব বিশ্বাসের ভাইরাস মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়ার। এটাই আজ সময়ের দাবি।

---

22 The American Religious Identification Survey gave Non-Religious groups the largest gain in terms of absolute numbers- 14,300,000 (8.4% of the population) to 29,400,000 (14.1% of the population) for the period 1990 to 2001 in the USA.

Also, in Australia, census data from the Australian Bureau of Statistics gives 'no religion' the largest gains in absolute numbers over the 15 years from 1991 to 2006. from 2,948,888 (18.2% of the population that answered the question) to 3,706,555 (21.0% of the population that answered the question).